রচনাকাল ১৯৫৭—১৯৬০

সূচীপত্র

কবির অন্যান্য কবিতার বই :

এই ভাই

ছেলে গেছে বনে

চিরকুট

নাজিম হিকমতের কবিতা

দিন আসবে

কাল মধুমাস

কাব্য সংগ্রহ

যেতে যেতে

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি ব'লে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি ক'রে আসি
অমনি ক'রে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়।
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস ক'রে বলল—

দেখলে !
কাণ্ডটা দেখলে !
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ··

২

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই ব'লে
বুড়োধাড়িদের একেবারেই
ভাল লাগল না।
আর তাছাড়া
গল্পটা বানানো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম ·
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে···

দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।
সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি ;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো ক'রে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।'...

লোকগুলোর চোখ চকচক ক'রে উঠল

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম

"তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।"

শুনে সে বলল :
"এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হ্যাঁ ক'রে বসে আছি।" '
বুড়োধাড়িরা আগ্রহে উঠে বসে
জিগ্যেস করল : 'তারপর ?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম—

'তারপর ? কী বলব—
সেই রাক্ষুসিই আমাকে খেলে॥'

পায়ে পায়ে

সারাক্ষণ
সে আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
            পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

তাকে বলি :   তোমাকে নিয়ে থাকার
সময় নেই
হে বিষাদ, তুমি যাও
এখন আমার সময় নেই
তুমি যাও।

গাছের গুঁড়িতে বুক পিঠ এক ক'রে
যৌবনে পা দিয়ে রয়েছে
একটি উলঙ্গ মৃত্যু—
আমি এখুনি দেখে আসছি

পৃথিবীতে গাঁক গাঁক ক'রে ফিরছে
যে দাঁত-খিঁচোনো ভয়,
আমি তার গায়ের চামড়াটা
খুলে নিতে চাই।

চেয়ে দেখো, হে বিষাদ—
একটু সুখের মুখ দেখবে ব'লে
আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে
চুল সাদা ক'রে আহম্মদের মা।

হে বিষাদ,
তুমি আমার হাতের কাছ থেকে সরে যাও
জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে।
হে বিষাদ,
হাতের কাছ থেকে সরে যাও
আগাছাগুলো নিড়োতে হবে।

যায় না ;
বিষাদ তবু যায় না।
সারাক্ষণ আমার পায়ে পায়ে
সারাক্ষণ
পায়ে পায়ে
ঘুরঘুর করে।

আমি রাগে অন্ধ হই
আমার বেদনাগুলো তার দিকে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি।
বলি : শয়তান, তোকে যমে নিলে
আমি বাঁচি।

তারপর কখন
কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না
চেয়ে দেখি
দূরে ব'সে সেই আমার বিষাদ
আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে
আমার অপূর্ণ বাসনাগুলোকে নিয়ে খেলছে

হাসতে হাসতে আমি তাকে
দুরন্ত শিশুর মত
কোলে তুলে নিই॥

দিনান্তে

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সরজমিন তদন্তে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
ভয়চকিত হরিণীর মত
আমাকে জড়িয়ে ধরল

হাওয়া॥

পোড়া শহরে

তেলচিটে সবুজ ঘাস একসঙ্গে লাইনবন্দী হয়ে
ঘাড় উঁচু ক'রে দেখছে—

কেমন ক'রে এ পোড়া শহরে
বুকের আঁচল সরিয়ে দিয়ে
কী আগ্রহে শুয়ে আছে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল—
রং যার
ঠিক চাঁপাফুলের মত।

দাঁড়ানো মানুষগুলোকে বগলদাবা ক'রে
তুলে নিয়ে
বেলা দশটার ট্রাম
ঝুলতে ঝুলতে গেল।

কালো কালো মাথাগুলো অদৃশ্য পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে
যেন আত্মসমর্পণের এক ভঙ্গিতে
হাত উঁচু ক'রে আছে।
কালো কালো মাথাগুলো
চোখে ফুটছে।

বাইরে শাড়িতে ঢাকা
দুটো শুভ্র পা
আমাদের দূরবর্তী ভবিষ্যতের মত—
তার মুখচ্ছবি কেমন
কোনোদিনই জানব না।

হঠাৎ
আমার ইচ্ছে হল ছুটে পালিয়ে যেতে।

আমার ইচ্ছে হল যেতে—
যেখানে তার চোখের
উজ্জ্বল নীল মণির মত আকাশ।
যেখানে ঢেউ তুলে আমাকে ডেকে নেবে নদী।
যেখানে যাব
আর আসব না।

তারপর ট্রাম থেকে নেমে
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলাম।
পালাতে পালাতে
পালাতে পালাতে
ইটকাঠের প্রকাণ্ড একটা হ্যাঁ-মুখ
আমাকে ঢেকে নিল॥

পাথরের ফুল

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে

এখন আর
আমি সেই দশাসই জোয়ান নই।

রোদ না, জল না, হাওয়া না—
এ শরীরে আর
কিছুই সয় না।

মনে রেখো
এখন আমি মা-র আদুরে ছেলে—
একটুতেই গলে যাবো।

যাবো বলে
সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও ?

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর
গাড়ি এখন ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছে।
মোড়ে
ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ?

২

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই ধূপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
সভা-টভাও হবে।
(একমাত্র ফুলের গলা-জড়ানো কাগজে লেখা
নামগুলো বাদে)
সমস্তই হুবহু মিলে গেল।

মনগুলো এখন নরম—
এবং এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচাটা উঠে আসবে।

এক কোণে ছেঁড়া জামা পরে
শুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে

ছেলেটা আমার
পুঁটুলি পাকিয়ে ব'সে।
বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি, এই তুই বীরপুরুষ ?
শীতের তো সবে শুরু—
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে ?

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

৩

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনোদিনই আমার টান নেই।

তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুল্‌কি—
যা দিয়ে কোনোদিন কারো মুখোশ হয় না।

ঠিক এমনটাই যে হবে,
আমি জানতাম।
ভালোবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে
এ আমি জানতাম।
যে-বুকের
যে-আধারেই ভ'রে রাখি না কেন
ভালোবাসাগুলো আমার—
আমারই থাকবে।

রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কিভাবে সকাল হয়;
আমাব দিনমান গেছে
অন্ধকাবের রহস্য ভেদ করতে।
আমি এক দিন, এক মুহূর্তের জন্যেও
থামি নি।
জীবন থেকে বস নিংড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই,
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
যেখানে যায়—
কথার সেই উৎসে,
নামের সেই পরিণামে,

জল-মাটি-হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

কাঁধ বদল করো।
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে দিক॥

যেন না দেখি

যেখানে আকাশের ছানিপড়া চোখের নিচে
তিন মাথা এক ক'রে আছে
লাঠি হাতে
খুনখুনে অন্ধকার

সেখানে সারাটা রাত
সারাটা দিন
শুধু টুপ টাপ
টুপ টাপ
মাটিতে পাতা পড়ার শব্দ

যেখানে স্টিমারের খালাসির মত
স্মৃতি
শুধু রশি ফেলে ফেলে
জীবনের জল মাপে

আমি জানি
শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া
একদিন আমাকেও সেইদিকে
ঠেলবে।
হে পৃথিবী, আমি যেন সেই
দিনের মুখ
না দেখি।

তার আগে
তুমি আমার দুটো চোখ
দুটো পায়ে
ঘুঙুরের মত বেঁধে দিও॥

লোকটা জানলই না

বাঁ দিকের বুক-পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়-হায়
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল।

অথচ
আর একটু নিচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ
তার হৃদয়

লোকটা জানলই না।

তার কড়িগাছে কড়ি হল
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে।
দেয়াল দিল পাহারা
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে।

তারপর
একদিন গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন

লোকটা জানলই না॥

যত দূরেই যাই

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম—

আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা

আমি যত দূরেই যাই॥

ফিরে ফিরে

সিঁড়ি দিয়ে ঘুবে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিল : আসবেন
দেখব, আসবেন
আচ্ছা, আসবেন দেখব।

বলেছিল।

সিঁডি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।

বলেছিলাম . মা আমার
খেলনা আনব—
মা আমাব,
আজ ঠিক আনব।

বলেছিলাম।

সিঁডি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি॥

কে জাগে

সেই কোন্ সকালে
এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
দূরে দূরে
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল

তারপব সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে
এক জায়গায় আবার আমাদের
মিলিয়ে দিয়ে গেল ।

বাইবে
আলোগুলোকে বাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে
দরজা দেবার শব্দে
এখনি ঘব অন্ধকাব কববে
এই শহর ।

এখুনি
বক্তে বক্তে শোনা যাবে
জলদ্গম্ভীব মহাকালেব হাঁক :
'কে জাগে ?'

ভালোবাসার গা থেকে
ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে
তারস্বরে সগর্বে বলে উঠব :
'আমরা ॥'

আরও গভীরে

মাথার ওপর গোল কালো পাথরটায়
শান দিচ্ছে নখ
বিদ্যুৎ
অন্ধ রাগে।

পিঁপড়েগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে
ছুটে পালাচ্ছে গর্তে।

ঝড় এখুনি উঠবে।

মাঠ জুড়ে থমথম করছে ভয়
ঘাসের ডগাগুলো কাঁপছে
আর কোথায় যেন ঝটপট
ঝটপট করছে
দিগ্‌ভ্রান্ত পাখিদের ডানা।

ঝড় যদি আসে আসুক
চলে যেতে কতক্ষণ ?

আমরা যেখানে আছি
আকাশে মাথা তুলে
সেখানেই থাকব

মাটির
আরও গভীরে
শিকড়গুলো চালিয়ে দিয়ে ॥

ঘোড়ার চাল

মাবা অত সহজ নয়
একটি আছে
আবেকটির জোড়ে।

ঘোডাগুলো বাঘেব মত খেলছে।

তোমাদেব রাজাগুলোকে সামলাও হে,
নইলে
এই কিস্তিতেই মাত যে!

ঘোডাগুলো বাঘেব মত খেলছে।

২

মরুভূমিব কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—

ভাগো!

রবারের বনে বনে ঝুলছে
দডিব ফাঁস।

পালাও।

লোভের কাঁটা-মারা জুতোগুলো
পায়ে পায়ে বেধে
ছিঁড়ছে।

৩

চাল ফেরত নেই,
সারা পৃথিবীটাকে বাজি রেখে
আমাদের খেলা।

ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক
আমরা আড়াই-ঘরের পাল্লায
ওদের পার।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে॥

গণনা

আমাকে একটা ফুলের নাম বলো-

আমি বলে দেব
ওদের কপালে কী লেখা আছে।

রক্তের মত লাল
আগুনের মত উদ্‌গ্রীব
নিশানের মত অশান্ত

মুষ্টিবদ্ধ
যার পাঁপড়িতে ঢাকা
এক ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্ষুধিত শপথ।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

রাস্তায় সারিবদ্ধ লাঠির শরশয্যা,
দু-নলের অনলে দুমদাম
মুখাগ্নি ;
তারপর কাঁদুনে গ্যাসের মত
ধোঁয়ায় কালো গাড়ি
আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে ।

আমি দেখতে পাচ্ছি—

হাতে হাতে ফিবছে একটা ফর্দ—
নিহতেব
আহতের
নিখোজেব ।

দিনেব আলোয়
মাটিতে থেবড়ে বসে
কাবা যেন হেঁকে হেঁকে
সংখ্যাগুলো অবিকল মিলিয়ে মিলিয়ে
নিচ্ছে ॥

রাস্তার লোক

চোখে পড়তেই
হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল লোকটা।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল,
না,
সে যা ভয় করেছিল তা নয়—

রাস্তার খোঁদলটার মধ্যে জমে রয়েছে
ট্রামলাইনের
সবচে-ধোয়া জল।

লোকটা আঁতকে উঠেছিল
কেননা সে জানত :
এখানে,
হ্যাঁ, এখানেই—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

তারপর মনে হল
মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গায়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মত
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে·
এখন বলুক সে কী করবে!

লোকটা চমকে উঠে
চোখ
সরিয়ে নিল।

এবার সে মুখ উঁচু ক'রে হাঁটবে
যেন কিছুতেই
তার পায়ের নিচে
রাস্তাটা না দেখা যায়।

দূরে
পুরনো গির্জার কাঁধের ওপর দেখো
কী সুন্দর টলটলে নীল
পুজোর আকাশ

দিনের নিবন্ত আলোয়
ঝুঁকে পড়ে
চোখ কুঁচকে দেখছে

এখন
ঘড়িতে ক'টা বাজল।

অমনি লোকটার বুকের মধ্যে
ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল।
এখন,
হ্যাঁ, এখনই তো—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

সামনে পা ফেলতে গিয়ে
লোকটা হঠাৎ
শিউরে পিছিয়ে এল।
ইস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল
মায়ের কোল-ছেঁড়া
একটা দুধের বাচ্চাকে।

তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে বুঝল
আসলে তার মনেরই ভুল ;

এ রাস্তাব কোথাও
কোনো লাশ
পড়ে নেই ।

ঠিক সেই সময়
লোকটা শুনতে পেল—

পেছন থেকে
একটা নিষ্ঠুব দজ্জাল স্মৃতি
তাব নাম ধ'বে
চিৎকাব ক'রে ডাকছে ।

হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ ক'বে
লোকটা তাড়াতাড়ি
পাশেব একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল ।

তাবপর যেতে যেতে
বন্ধ দু কানে সে শুনতে পেল
রাবণের চিতা
দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে ॥

কেন এল না

সারাটা দিন ছেলেটা নেচে নেচে বেড়িয়েছে।

রাস্তায় আলো জ্বলেছে অনেকক্ষণ
এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

ব'লে গেল
মাইনে নিয়ে সকাল-সকাল ফিরবে।
পুজোব যা কেনাকাটা
এইবেলা সেবে ফেলতে হবে।

ব'লে গেল।
সেই মানুষ এখনও এল না।

কড়ার গায়ে খুন্তিটা
আজ একটু বেশি বকম নড়ছে।
ফ্যান গালতে গিয়ে
পা-টা পুড়ে গেল।

জানলার দিকে মুখ ক'রে
ছেলেটা বই নিয়ে বসল মাদুরে
সামনে ইতিহাসের পাতা খোলা—

ঘড়িতে টিকটিক শব্দ।
কলে জল পড়ছে।
ও-বাড়িব পাঁচিলটা থেকে লাফিয়ে নামল
একটা গোঁফঅলা বেড়াল।

বাপের-আদরে-মাথা খাওয়া ছেলের মত
হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে
অবাধ্য—
যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে
নড়বে না।

এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

রান্না কোন্‌কালে শেষ
গা ধোয়াও সারা
মা এখন বুনতে ব'সে
কেবলি ঘর ভুল করছে।

খুট ক'রে একটা শব্দ—
ছিটকিনি খোলার।
কে ?
মা, আমি খোকা।

গলির দরজায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে।
এখন রেডিওয় খবর বলছে।
মানুষটা এখনও কেন এল না ?

একটু এগিয়ে দেখবে ব'লে
ছেলেটা রাস্তায় পা দিল।
মোড়ে ভিড়,
একটা কালো গাড়ি ;
আর খুব বাজি ফুটছে।

কিসের পুজো আজ ?
ছেলেটা দেখে আসতে গেল।

তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।

ছেলে এল না॥

বারুদের মত

আকাশ রক্তচক্ষু,
পশ্চিমের সব জানলাই
হাট ক'রে খোলা।

গরাদের এপারে দেখো—
কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাকে
এক টুকরো রোদ
মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে
হাঁটু মুড়ে
যেন মগরেবের নমাজ পড়ছে।

ঘরের বাইরে
ঢেউতোলা টিনের নিচে
দায়মল-কাটা ছায়া
এখন মুরগিগুলোকে কুঁড়ো খাওয়াচ্ছে ;

একটু পরেই উঠে গিয়ে
ঘাট থেকে
অন্ধকার কাঁধে ক'রে আনবে।

তারপর বেড়ার গায়ে
জোনাকিরা দল পাকিয়ে
উড়োজাহাজের আলোর সংকেতের মত
সারা রাত
জ্বলবে আর নিববে।

তারপর শেষ রাত্রে
রাস্তায় ভারী বুটের শব্দে
গায়েবী টুপি প'রে
উঠোনে পা নামাবে ষড়যন্ত্র—
কানের কাছে মুখ এনে
ফিসফিস ক'রে বলবে

'অন্ধকার
কালো বারুদের মত,
দেশলাইটা দাও তো॥'

বোকা

ওহে খোকা ! ব'সে পড়ো, ব'সে—
এদিকে তো পেকে গেল দাড়ি
কেন আর করো এ বয়সে
এর ওর তার সঙ্গে আড়ি ?

তার চেয়ে দেখে ডাইনে বাঁয়ে
পথে এসো। বদ্‌লিয়ে স্বভাব
চোখ বুঁজে হাত রেখে পায়ে
জোরসে বলো : ভাব ভাব ভাব !

এখনও নামের ঠিক আগে
চন্দ্রবিন্দু নেই, আজও আছো—
এই ঢের। বুকের চেরাগে
বাতি নিববে, বেশি যদি হাঁচো।

জলে আছে সুবিধের সাঁকো।
ঘাড়টা নুইয়ে হও কুঁজো—
কথাই রয়েছে : যাকে রাখো
সেই রাখে। ভালো ক'রে বুঝো।

অতএব বেছে ফেলো পোকা।
হাত তোলো। উঠে যাক তাঁবু।
মালা নাও, নাম করো, বোকা—
কুশাসনে ব'সে, হয়ে বাবু॥

রংরুট

হেরেছি ? তাতে কী ?
কখনও যায় না শীত
এক মাঘে।
আছে
লড়াইতে হারজিত।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
হাতের চেটোয়।

এসো নিচু হয়ে ভরি
শুকনো বারুদ
আশাব নতুন খোলে।
বীরেব হৃদয়
যেন লক্ষ্য না ভোলে।

অন্ধকারের পর্দা থাকুক
টানা।
সবুজ পাতায় ঢেকে দাও
আস্তানা।
মুখে এঁটে নাও মুখোশ ,
আস্তে কথা।
চুপ।
যেন টেব পায় না অবাধ্যতা।

পা তুলে টেবিলে
স্পর্ধা নাচায় ছড়ি
হাতের চেটোয়।

ক'টা বাজে ?

দেখো ঘড়ি।

বাইরে

কিসের আওয়াজ ?

মিছিলে কারা ?

বাজাতে বাজাতে চলেছে

কাড়া-নাকাড়া।

চোখে চোখে চায়

যারা ছিল দলছুট।

নাম লেখো। ময়দানে যাবে রংরুট।

হেরেছি ? তাতে কী ?

কখনও যায় না শীত

এক মাঘে।

আছে

লড়াইতে হারজিত॥

এখন যাব না

বাতাসের কান আছে দেখছি—
হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন,
না, আমি গেলাম না নয়
আমাকে নিল না।

আপনাকে বলেই বলছি—
দেখুন, ও যে-গাছের আঙুর
তাতে টক না হয়ে যায় না।
আর তা ছাড়া এও তো ঠিক
সব বেড়ালেব ভাগ্যেই
শিকে ছেঁড়ে না।

আপনাকে এই বলে দিচ্ছি, দেখে নেবেন·
কারো বাপের সাধ্যি নেই
লাথি মেরে
আমাকে এই পৃথিবী থেকে হটায়।
আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম।
যতক্ষণ বরাবরের মত
মানুষেব কাজ স্বাস্থ্য খাদ্য শিক্ষা নিরাপত্ত
একটা ভাল ব্যবস্থা না হচ্ছে
ততক্ষণ
মৃত্যুর গলায় পা দিয়ে হলেও আমি বাঁচ

তারপর জীবন যখন খুব করে সাধবে
তখন ভেবে দেখব

॥

ছাপ

কেউ দেয় নি কো উলু
কেউ বাজায় নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছুডাক।

পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলে নি হার ;
মাটিতে রঙীন আশা
পেতেছিল সংসার।

আকাশের নীল গায়ে
শপথের ইস্পাত ,
দরজায় পিঠ দিয়ে
বাইরে গভীর রাত।

সারা বাড়ি থমথমে
সিঁড়ি একদম চুপ ;
দেয়ালে নাচায় ধোঁয়া
জানলায় রাখা ধূপ।

মুঠো মুঠো তারা নিয়ে
কড়ি খেলছিল মেঘ ;
ভুলে গেছে বুঝি হাওয়া
ঝড়ঝঞ্ঝার বেগ !

হঠাৎ যে কোথা থেকে
ছুটে এসেছিল ঝড় ;

ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে
দুলে উঠেছিল ঘর।

দু জোড়া বন্ধ ঠোঁটে
থেমে গিয়েছিল গান,
চোখে রেখেছিল হাত
টেবিলের বাতিদান।

জীবনের হ্রদে স্মৃতি
চোখ বুঁজে দিল ঝাঁপ;
ভিজিয়ে সে জলছবি
তুলে নিল এই ছাপ॥

আলো থেকে অন্ধকারে

এ শহরে

যেখানে গাছের নিচে
ঘাড় হেঁট ক'রে
চোখ রেখে একদৃষ্টে
কালো কালো খোয়া-ওঠা পিচে,
সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভাল মন্দ ইত্যাকার
নানান বিষয়ে
ভাবনায় নিগূঢ় হয়ে
নখ খুঁটছে
মাথায় ঘোমটা দেওয়া আলো

সেখানে দাঁড়ালো
সারা অঙ্গে পাউডারের খড়ি মেখে
ভয় ভালবাসা লজ্জা
সমস্ত ঘুচিয়ে
তুই বুকে তীক্ষ্ণ দুটি বল্লম উঁচিয়ে
ক্ষণকাল

তারপর
রাস্তার অপেক্ষমাণ ভিড় থেকে
গেঁথে নিয়ে রাত্রের শিকার
ময়দানের দিকে গেল হেঁটে

সমস্ত সভ্যতা ভুলে
খালি পেটে
নখে দাঁতে জিভে দিয়ে ধাব
দু পাশে দাঁড়িয়ে উঠে
যেখানে হিংস্র অন্ধকাব
টান মেরে খুলে দেবে নরকের দ্বাব ॥

পা রাখার জায়গা

পৃথিবীটা যেন রাস্তার খেঁকী কুকুরের মত
পোকার জ্বালায়
নিজের ল্যাজ কামড়ে ধরে
কেবলি পাক খাচ্ছে ;
আর একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা প'ড়ো বাড়িতে
তার বিকট আর্তনাদই হল
জীবন

এই রকমের একটা শক্ত খোলসে ঢাকা
তরল বিষয়ের ওপর
মনকে তা দিতে বসিয়ে
একজন
একটা চাবির গোছা
দু হাতে ঢালা-উপুড় করতে করতে
হেঁটে
রাস্তা পার হচ্ছিল

হঠাৎ ঘ্যাঁচ ক'রে শব্দ ।
আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ফুটপাথে ওঠা ।

কী কারণে বুক ধড়াস ধড়াস করছে,
কেনই বা গলা শুকিয়ে কাঠ,
এসব তলিয়ে ভাল ক'রে বুঝে নেবার জন্যে
রেলিঙে ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়াতে হল ।
এক কথায়,
মাতালের মত ভুরু উঁচিয়ে
চোখ গুগলি ক'রে তাকানো চারটে চাকা
আর একটু হলেই

তাকে একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে
ফেলছিল।

ছোকরার আক্কেল দেখে এক বুড়ো
ছানি-কাটা চোখের চশমাটা তার মুখের গোড়ায়
দূরবীনের মত করে ধরে,
ডান হাতের লাঠিটা মাটি ছেড়ে ঈষৎ তুলে,
মুখ বুঁজে নাকের দুটো বড়ো ফুটো দিয়ে
আর হাতের লাঠিটা দিয়ে খুব জোরে
'হুঁঃ' আর 'ঠকাস'
এই দুটো শব্দ বার করে
যেদিক দিয়ে উজিয়ে এসেছিল সেই দিকেই ফের
চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে চাবির গোছাটা পকেটে রাখতে গিয়ে
নজরে পড়ল
গোটা রাস্তা তার দিকে ফিরে
তাকে আঙুল দিয়ে শনাক্ত করছে।
নিজেকে একটু একা পাবার জন্যে
তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে সে গা ঢাকা দিল।

একটু হেঁটে যাবার পর একটা চায়ের দোকান।
গরম কাপের ছ্যাঁকায়
মনটা ঠাণ্ডা হল।
সামনের ফুটপাথে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে
উবু হয়ে বসে লোহার কড়াইয়ের একটা উনুন-
হাওয়ার মুখে খই ফুটিয়ে
কাঠকয়লার আগুনে ভুট্টাগুলোকে পোড়াচ্ছে।
মাটিতে চাপ-চাপ রক্তের মত ফুল;
ভুট্টার রং মানুষের গায়ের মত।

খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে
লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ল।
তিন নয়া পয়সার মিঠে পানে
মুখটা মিষ্টি ক'রে
মোড়ের ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে
হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

তারপর লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে
পা ধরে যাওয়ায়
যেখানে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে সামনেই একটা
শো-কেস।
ভেতরে খুব বাহারে সব জিনিস
আহ্‌হা। রেফ্রিজারেটার। বেশ রেডিওটা! ওহো,
তাহলে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস
এখন বেশ শস্তায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
একটা ভাল শাড়ি আর মেয়ের একটা ফ্রক
কেনা দরকার অনেক দিন থেকে বলছিল বটে।
ঘড়ি কিনব
সবুর করো, আরেকটু শস্তা হোক।
আচ্ছা, একটা ইলেকট্রিক ক্ষুরের দাম কত?
এহে, দাম-লেখা কাগজটা পিছন ফিরে রয়েছে।

তারপর সে গালে হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল
এখুনি কামাবার দরকার আছে কিনা।
কাঁচের গায়ে ছায়া পড়েছে,
আরও একটু কাছে সরে গেল।
জামা নয়, শাড়ি নয়, রেডিও নয়, ঘড়ি নয়—
কী আশ্চর্য—
কাঁচের গায়ে অবিকল সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে,
তার সামনে আস্ত একটা মানুষ

বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে।
দেখে সে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল
পৃথিবীর
জীবনের
সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে
যে দুটো হাত—
কী আশ্চর্য, সে হাত দুটো
সমস্তক্ষণ তো তার পাশাপাশিই ছিল

তারপরই একটা ভর্তি বাসের হাতল ধরে
ছুটতে ছুটতে—
সেই লোকটির মালকোঁচা-মারা আস্তিন-গোটানো
বাজখাঁই গলা শোনা গেল :

হাতটা সরিয়ে নিন না, মশাই।
ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া ক'রে,
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা॥

মেজাজ

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড়বিড় ক'রে মালা জপছেন ;
বউ
গটগট গটগট ক'রে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া ; রোজকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ ক'রে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং
মালাটা থেমে গেল ; এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেইদিকে চলে পড়ল।
নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।

বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচ্‌ড়ে আঁচ্‌ড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম থনর থন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ ক'রে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিন্‌সের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুনে
পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—
হ্যাঁ, দিয়েছিল!
গলায় রস্থুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল।
ভাশুরপো ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ করে মরলে কী হয়?
চণ্ডী আর বলেছে কাকে।

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট ক'রে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন।'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায়-দেওয়ার মত নয়
বড্ড ন্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে ?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি ?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে ;
মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে ;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউদির মত ভূশুণ্ডি কালো নয়।
বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন : আচ্ছা থাক, এখন যাও।

বউ মাথা উঁচু ক'রে
গটগট গটগট ক'রে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হ'য়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—

বউ বলছে : 'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।
কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা ; মা কান খাড়া করলেন।
বলছে : 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস ক'রে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে
'কী নাম দেবো, জানো ?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে॥'

ফলশ্রুতি

ফলের দোকানের সামনে
একসময়ে একটা বাঁধা হরিণ
গলার শেকলে টান পড়িয়ে
আড়চোখে এই শহরটাকে দেখত।

কোনোরকম আড়াল না নিয়ে,
কোথাও মাথা না গুঁজে —
সরাসরি আকাশের দিকে মুখ রেখে
দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে ডাকাবুকো রাস্তাটা।

সকাল হলেই
অলিগলি আর গাড়িবাড়ির আড়াল থেকে
কলকল ক'রে বেরিয়ে পড়ত মানুষ,
তারা সামনে দিয়ে হনহনিয়ে যেত —
নিশ্চয় শিকারে।

বাসগুলো মোড় নিত হুমহাম শব্দে,
তাদের বন্ধ খাঁচায় গর্‌র্ গর্‌র্ করত
ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা,
ট্রামগুলো চলে গেলেই
তারের খেলা দেখাতে দেখাতে যেত
ছুরিতে শান দেবার একটানা হিসহিস শব্দ।
ফুটপাথের কোলের কাছে কোথাও
তৃষ্ণার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত খাদে—
সামনে একটা থাম থাকায় দেখা যেত না।
মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে আসত বিড়ির পাতা—
তাতে নানা মাপের জানলা-দরজা ফোটানো,

তার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ শহরকে দেখতে চাইত
দূরের এক ঘোমটা দেওয়া অরণ্য।

ফলের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে যেতে
লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ত—
বাঃ, কী সুন্দর ;
দেখো, দেখো ঠিক ছবির মতন।
হরিণটা মুখ বিষ ক'রে তাকাত।
সুন্দর ? মরণ আর কি ! তার দাঁত কড়মড় করত।
গলায়-শেকল-পরানো এই পোষা প্রভুভক্ত 'সুন্দর' শব্দটা
তার কিছুতেই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না।
তার নাকের কাছে ঘোরাফেরা করছিল একটা আঁশটে সন্দেহ
শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।
মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,
কিন্তু রক্তের কোনো দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বাঃ, কী সুন্দর' বলে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।

বাঁধা হরিণের মনে হল
এর চেয়ে ঢের ভাল হত যদি তার প্রাণ-হাতে-করা সৌন্দর্য
মানুষ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে একাগ্র লক্ষ্যে ধনুকে টঙ্কার তুলে দেখত।
ঢের ভাল ছিল সেই অকপট স্থূল ব্যবহার
আগুনে চড়ে
যা রসনায় গিয়ে মানুষকে তবু যা-হোক হৃষ্টপুষ্ট করত।
সন্দেহটা চারিদিকে ক্রমশ পচতে থাকায়
হরিণের মুখে
পয়সা দিয়ে কেনা ঘাস আর রুচল না—
ঠোঁটের সামনে
যেমন তেমনি উপুড় হয়ে রইল।

শেষে একদিন
গলায় শেকল খুলে রেখে
সেই হরিণকে
নড়বড়ে লোহার চাকাগুলো একটা গাড়ির ঘাড়ে চড়ে
ড্যাডাং-ড্যাং-ড্যাডাং-ড্যাং শব্দে
ঠ্যাং আকাশে আর চোখ কপালে তুলে
মহানন্দে এই শহরের বাইরে চলে যেতে দেখা গেল ॥

ছেই

ভাজা ইলিশের গন্ধে গলি ছেড়ে কিছুতেই নড়তে চায় না হাওয়া।
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে ক্ষিধে করতে। পাঁচিলে বেড়াল দিচ্ছে ডন ;
কেননা আল্সেয় কাক। গালে হাত দিয়ে ভাবছে একা বোকা হাবা—
হায়, মেয়েটিব আজ পাকা-দেখা। পাত্র কিনল মেড-ইন-লণ্ডন।
হাতে আরশি। গোঁফ ছেঁটে বাবু দেন আপনাকে আপনি বাহাবা।
রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক-আধ ডজন।
রোয়াকে বসেছে আড্ডা পুরোদমে। আজ কিন্তু চা শুধু, টা নেই।
আকাশটা দেখা যায় না ; দেখা গেলে মনে পড়ত কবিতা-টবিতা।
দমকল পুরুত গেল ঘণ্টা নেড়ে। কিছু একটা ঘটেছে কাছেই।
এখনও পোকায় খায় নি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।
ঠিকে-ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই,
চোখের জলের মত। হায়,আজ পাকা-দেখা। অমনি পাকা গিন্নী পৃথিবীটা
শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে দিয়ে বলে উঠল— ছেই-ছেই-ছেই।

দূর থেকে দেখো

আমি আমার ভাবনাগুলোকে
চামচে ক'রে নাড়তে থাকব—
অন্য কোনো টেবিল থেকে তুমি শুনো।

সামনে দাঁড় করানো থাকবে কাপ
আমার কোলের ওপর দুটো আঙুল
কুরুশকাঠির মত বুনবে
স্মৃতির জাল—
তুমি অন্য কোনো টেবিল থেকে দেখো।

তারপর
যখন জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে সময়
চেয়ারে শব্দ ক'রে আমি উঠে পড়ব
পেছনে একবারও না তাকিয়ে
আমি চলে যাব
যেখানে বাড়িগুলোর গায়ে
চাবুক মারছে বিদ্যুৎ
যেখানে গাছগুলোকে চুলের মুঠি ধরে
মাটিতে ফেলে দিতে চাইছে হাওয়া
যেখানে বন্ধ জানালায় নখ আঁচড়াচ্ছে
হিংস্র বৃষ্টি।

তুমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো॥

এই পথ

চোখে চোখ পড়তে

পুরনো বন্ধুত্ব
একটু হেসে
হাত নেড়ে চলে গেল।

কাঁচের গায়ে চোখ রেখে
পেছন ফিরে একবার চাইলেই
দূর থেকে দেখতে পেত—

ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উটকো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে ক'বে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মত
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল।

তাকে জুতোর তলায় চেপে,
চারিদিকে তাকিয়ে,
ভাল ক'রে গাড়িঘোড়া দেখে
তারপর খুব সাবধানে
আমি রাস্তা পার হলাম।

২

বুড়োধাড়ি গাছ

যেন কোমরে ঘুনসি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে

ভাঙা জং-ধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল।

একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

৩

কলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে

ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ।

মাথার উপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের স্বর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।

তারপর আবার ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
ঝাঁঝরিতে।

৪

আমি আজও ভুলি নি
সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা

আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি।

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলাৎ চ্ছল ছলাৎ চ্ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই
রাস্তায় খুব হল্লা হল।
পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে
কে একজন পেছন থেকে বলল —

মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে॥

মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

আরে! মুখুজ্যেমশাই যে। নমস্কার, কী খবর ?
আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত।
তা বেশ। কিন্তু দেখো মুখুজ্যে,
আমার এই ডানদিকটাকে বাঁদিক
আর বাঁদিকটাকে ডানদিক ক'রে
আয়নায় এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া—
আমি ঠিক পছন্দ করি না।
তার চেয়ে এসো, চেয়ারটা টেনে নিয়ে
জানলায় পা তুলে বসি।
এককাপ চায়ে আর কতটা সময়ই বা যাবে ?

দেশলাই ? আছে।
ফুঃ এখনও সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে।
তোমার কপালে আর ক'রে খাওয়া হল না দেখছি।
বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়
যদি কৃতকার্য না হলে।

২

আকাশে গুড়গুড় করছে মেঘ
ঢালবে।
কিন্তু খুব ভয়ের কিছু নেই,
যুদ্ধ না হওয়ার দিকে।
আমাদের মুঠোয় আকাশ,
চাঁদ হাতে এসে যাবে।

ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,
অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই
পাল্লা ভারী হচ্ছে।

ঘৃণার হাত মুচড়ে দিচ্ছে ভালবাসা।
পৃথিবীর ঘর আলো ক'রে—
দেখো, আফ্রিকার কোলে
সাত রাজার ধন এক মানিক
স্বাধীনতা।
পাজীর পা-ঝাড়াদের আগে যারা কুর্নিশ করত
এখন তারা পিস্তল ভরছে।
শুধু ভাঙা শেকলগুলো এক জায়গায় জুটে
এই দিনকে রাত করবার কড়ারে
ডলারে ফলার পাকাবার
ষড়যন্ত্র আঁটছে।

পুরনো মানচিত্রে আর চলবে না হে,
ভূগোল নতুন ক'রে শিখতে হবে।
আর চেয়ে দেখো,
এক অমোঘ নিয়মের লাগাম-পরা
ঘটনার গতি
পাঁজির পাতায় রাজজ্যোতিষীদের
দৈনিক বেইজ্জত করছে।

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ
আত্মহত্যা।
দড়ি আর কলসি মজুত
এখন শুধু জলে ঝাঁপ দিলেই হয়।

পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়।

নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।
হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে
কিন্তু যখন হবে
তখন খাতা খুলে দেখে নিও
অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে যাচ্ছে।

৩

দেখো মুখুজ্যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় করে
যখন অমন সুন্দর বাইরেটা
আমার এই আগোছালো ঘরে হারিয়ে যায়।

যখন দেখি ঠিক আমারই মত দেখতে
আমার দেশের কোনো ভাই
উলিডুলি ছেঁড়া কাপড়ে
আমাকে কাঁদাতে পারবে না জেনেও
বলে বলে দুঃখের কথাগুলোতে ঘাঁটা পড়ায়—
আমার লজ্জা করে।

পাঞ্চেতের এক সাঁওতাল কুলি দেখতে দেখতে
ওস্তাদ ঝালাইমিস্ত্রি হয়েছিল—
এখন আবার তাকে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে পেটভাতায়
পরের জমিতে আদ্যিকালের লাঙল ঠেলতে হচ্ছে।
এক জায়গায় রুগী ডাক্তার অভাবে মরছে,
অন্য জায়গায় ডাক্তার রুগী অভাবে মরছে।
কেন হয়?
কেন হবে?

আমি দেখে এসেছি নদীর ঘাড় ধরে
আদায় করা হচ্ছে বিদ্যুৎ—
ভাল কথা।
কলে তৈরি হচ্ছে বড় বড় রেলের ইঞ্জিন—
খুব ভাল।
মশা মাছি সাপ বাঘ তাড়িয়ে
ইস্পাতের শহর বসেছে—
আমরা সত্যিই খুশী হচ্ছি

কিন্তু মোটেই খুশী হচ্ছি না যখন দেখছি—
যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর যার ভাত আছে তার হাত নেই।

তবু যদি একটু পালিশ থাকত।
তা নয়,
মুচির দোকানের লাশে-চড়ানো জুতোর মত
মাথার ওপর ঝুলছে।

গদিতে ওঠবস করাচ্ছে
টাকার থলি।
বন্ধ মুখগুলো খুলে দিতে হবে
হাতে হাতে ঝনঝন ক'রে ফিরুক।
বুঝলে মুখুজ্যে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না
আড় হয়ে লাগতে হবে।

৪

যারা হটাবে
তারা এখনও তৈরি নয়।

মাথায় একরাশ বইয়ের পোকা
কিলবিল করছে ;
চোখ খুলে তাকাবার
মন খুলে বলবার
হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবার—
মুখুজ্যে, তোমার সাহস নেই।

আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে ক'রে তোলো।
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।

সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো ;
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় বেখে
পট্ ক'রে একটা শব্দ তোলো

দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

মুখুজ্যে, তুমি লেখো॥